সেক্যুলারিজম

বাংলাদেশের বাস্তবতা থেকে কিছু ভাবনা

আবুল মোমেন

সেক্যুলারিজম গণতন্ত্রের মতই পশ্চিম থেকে উদ্ভূত একটি ধারণা। এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আজকাল ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ইহজাগতিকতাই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও আমার মনে হয় ধর্মনিরপেক্ষতাই সেক্যুলারিজমের অধিকতর নিকটবর্তী শব্দ, তবুও এ নিয়েও সমস্যা আছে। একটি ধারণাকে একটিমাত্র শব্দে অনুবাদ করা কঠিন, কারণ ধারণার পেছনে থাকে ভাবনার ঐতিহ্য এবং সংশিষ্ট নানান অনুষঙ্গ। ইহজাগতিকতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা এ দুয়ের কোনটিই এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্বতন্ত্র দার্শনিক প্রত্যয় ও ধারণা হিসেবে চর্চা হয়নি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে প্রচার চালিয়ে নিন্দুকেরা সাধারণ জনকে ভালোভাবে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। এদিকে ইহজাগতিকতার বোধ এবং এর নানান অনুষঙ্গ ছাড়া কোন মানবসমাজ তো বিকশিত হয়নি, বাঙালি সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তাতেও দুটো বেশ বড় ফাঁড়া কাটানোর দায় এসে পড়ে– *এক.* ইহজাগতিকতার যেহেতু একটি পাল্টা বিপরীত শব্দ আছে পরজগৎ (ইহকাল–পরকালের মত), তাই মানুষ ধরে নিতে পারে যে এ ধারণা পোষণ করার অর্থ পরজগৎ এবং সেই সূত্রে ধর্মকে অস্বীকার করা। এই ভক্তিবাদী বৈরাগ্যবাদী ধর্মরসে সিক্ত প্রধানত ধর্মভীরু মানুষের সমাজে ধারণা হিসেবে ইহজাগতিকতাকে নিয়ে মানুষ যে ফাঁপড়ে পড়বে এবং ভুল বোঝার সমূহ সম্ভাবনা যে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইংরেজি সেক্যুলার শব্দের বিপরীত কোন পাল্টা শব্দ নেই। এর সহজ কারণ রাষ্ট্রসাধনার সাথে সাথে ধারাবাহিক নানা সংগ্রাম–সাধনার এক পর্যায়ে গণতন্ত্রের আবশ্যিক অনুষঙ্গ হিসেবে এই প্রত্যয়টি তাদের মনে তৈরি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই খেয়াল করেছেন যে ভারতবর্ষে, বাংলাসহ, সমাজই প্রধান, রাষ্ট্র নয়; রাজা আর তার শাসন নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ বহুকাল মাথাই ঘামায়নি। তাদের শাসন–পালন বিষয়ক চিন্তা ঘুরপাক খেয়েছে সমাজ আর সমাজপতিদের নিয়ে। রাষ্ট্রশক্তির দখল নিয়ে সপ্তম শতাব্দীতে যখন মাৎসন্যায় চলেছিল কিংবা ১৭৫৭ সালে যখন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ শক্তির কাছে নবাবের পরাজয়ে বাংলার 'স্বাধীনতা' বিপন্ন হচ্ছে তখনও সমাজ এতে নাক গলায়নি, আপন বৃত্তে নিবিষ্ট ছিল।

পশ্চিমে নানা প্রকারের দাসপ্রথা আর সামন্তপ্রথার দাপটে প্রজারা রাজার শাসনের চোটপাট ভালোই বুঝত। আর যখন খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটল তখন চার্চ ও রাষ্ট্রশক্তি জুটি বেঁধে প্রজাসাধারণের ওপর কড়া শাসন চালিয়েছে। অধিকাংশ প্রজার জন্যে তা নিপীড়ন ও শোষণেই পরিণত হয়েছিল। ইউরোপে ১১৮৪ থেকে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইনকুইজিশনের নামে অসংখ্য মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয় ধর্মের দোহাই দিয়ে। ফলে শোষণমুক্তির দায় তো তাদের নিতেই হয়েছে।

চুম্বকে এটুকু এখানে স্মরণ করতে পারি, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসার, ইউরোপ ভূ-খণ্ডে খনিজ সম্পদের সন্ধান লাভ, শিল্প উৎপাদনের সূত্রপাত ইউরোপে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে থাকে। এই সমৃদ্ধির প্রভাবে বাহ্য বস্তুগত পরিবর্তনের সাথে সাথে চিন্তার জগতেও আলোড়ন ওঠে। সঙ্গে সৃজনশীলতার জোয়ার আসে। বাণিজ্য বিপ্লবের অনুবর্তী হয়ে পরপর ঘটে গেল রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন, ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটে এলো যুক্তিচর্চার কাল, তাকে অনুসরণ করল আলোর দীপ্তি বা এনলাইটেনমেন্ট। কত রকম ভাবনা ও ধারণার চর্চা করলেন দার্শনিকেরা যা ধর্মের সংশ্লিষ্টতা, মুক্ত উদারনৈতিক ও ইহজাগতিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শন তৈরিতে সাহায্য করেছে।

এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিক, যেমন- ভোলতেয়ার, রুশো

ও হিউম বিরাজমান প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র ও গীর্জা, উভয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন এবং উভয়ের দিকে সমালোচনার তোপ দেগেছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না ভোলতেয়ার–রুশোদের চিন্তায় অনুপ্রাণিত ছিল বলেই ফরাসি বিপ্লব কেবল রাষ্ট্রকে নয় চার্চসহ গোটা পুরোনো সমাজব্যবস্থাকেই– তাঁদের ভাষায় ancient regime-কেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। তখনকার মত রাষ্ট্রবিপ্লব হিসেবে ব্যর্থ হলেও রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্যসহ সর্বত্র আধুনিকায়নে এ বিপ্লবের প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

ফ্রান্সের চার্চ (মূলত রোমান ক্যাথলিক চার্চ) বিপ্লবের ঝড় সামলে টিকে গেলেও ভূ-সম্পত্তির মালিকানাসহ দ্বিতীয় এস্টেটের মর্যাদাই হারায়নি শুধুই হয়ে পড়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ ঘটনা থেকেই বলা যায়, ফরাসি দেশে সেক্যুলারিজমের সূত্রপাত। আরও পরে ১৯০৫ সালে ফ্রান্সে গীর্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের যে আইন গৃহীত হয় তাতে রাষ্ট্রের কোন ধর্মকে স্বীকৃতি দান বা অর্থ যোগানো নিষিদ্ধ করা হয়। সংবিধানে ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ফরাসি এ শব্দটি ইংরেজি সেক্যুলারের অনুরূপ ভাবই বহন করে। সে অর্থে আদর্শ সরকার ও রাষ্ট্র ধর্মীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান নেবে। ১৮০২ সনের নববর্ষের দিন টমাস জেফার্সন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন, "I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people which declared that their legislature should 'make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof,' thus building a wall of separation between Church and State", চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দেয়াল তোলার কথা বলেছেন জেফার্সন।

মনে করা যেতে পারে, যে ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ভারতীয় এলিট শ্রেণী, সেক্যুলারিজম বলতে মনে করেছেন সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধ হবে না। বরং ধর্মকে গ্রহণ ও সহনের মনোভাব থেকে রাষ্ট্র সব ধর্মের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কাজ করবে। উপমহাদেশে ধর্মসাম্প্রদায়িক শান্তি-সহিষ্ণুতা রক্ষার গুরুত্ব রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার এজেন্ডার চেয়ে অনেক বেশি বলেই মনে করা হয়েছে সব সময়। ফলে অন্তর্নিহিত ভাব, প্রত্যয় ও শক্তি অনুধাবনের মাধ্যমে সেক্যুলারিজমকে বোঝার চেষ্টা এখানে হয়নি বা হওয়া সম্ভব ছিল না, হয়ত তাই মোটা দাগে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সাথে একে এক করে ফেলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার নেহেরুর আমলে কিন্তু ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র হয়নি, হয়েছে তাঁর কন্যা ইন্দিরার আমলে ১৯৭৬–এর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে।

গণতন্ত্রের সবলতা ও সার্থকতা যেহেতু সব নাগরিকের সমানাধিকারের ওপর নির্ভরশীল তাই রাষ্ট্র যেন কারও অধিকার, বিশেষত ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, জাতি, মতামত ইত্যাদি নানা দিক থেকে যারা সংখ্যালঘু তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে, সেদিকে খেয়াল রাখা আবশ্যিক। সেদিক থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সেক্যুলার হতেই হবে। হ্যারল্ড লাস্কি বলেছেন, "Secularism demands reason as its weapon"। ঠিকই, সমাজে যদি যুক্তির চর্চা না হয় তাহলে তার পক্ষে সেক্যুলার হওয়া অসম্ভব।

নেহেরু এবং গান্ধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে ওঠার ইতিহাসের দুই প্রতীক ও নায়ক। দু'জনের একজন সংশয়বাদী, প্রায় নাস্তিক, অপরজনের জীবনদর্শন, এমনকি রাজনৈতিক দর্শনেও ধর্ম কেন্দ্রীয় বিষয়। এ দু'জনের একজন আধুনিক সেক্যুলার ভারতের জাতির জনক এবং অপরজন সেই রাষ্ট্রের স্থপতি। ভারতের সেক্যুলারিজম তাঁদের দু'জনকেই ধারণ করবার চেষ্টা করেছে। এঁদের রাজনৈতিক সাথী খোদার খেদমতগার খান আবদুল গাফ্ফার খানের কথাও এ সূত্রে ভাবতে পারেন। মনে করা যেতে পারে, যে ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ভারতীয় এলিট শ্রেণী, সেক্যুলারিজম বলতে মনে করেছেন সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধ হবে না। বরং ধর্মকে গ্রহণ ও সহনের মনোভাব থেকে রাষ্ট্র সব ধর্মের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কাজ করবে। উপমহাদেশে ধর্মসাম্প্রদায়িক শান্তি-সহিষ্ণুতা রক্ষার গুরুত্ব রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার এজেন্ডার চেয়ে অনেক বেশি বলেই মনে করা হয়েছে সব সময়। ফলে অন্তর্নিহিত ভাব, প্রত্যয় ও শক্তি অনুধাবনের মাধ্যমে সেক্যুলারিজমকে বোঝার চেষ্টা এখানে হয়নি বা

হওয়া সম্ভব ছিল না, হয়ত তাই মোটা দাগে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সাথে একে এক করে ফেলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার নেহেরুর আমলে কিন্তু ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র হয়নি, হয়েছে তাঁর কন্যা ইন্দিরার আমলে ১৯৭৬–এর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। অনেক ইউরোপীয় তাত্ত্বিক ভারতীয় সেক্যুলারিজমকে আদালাভাবে দক্ষিণ এশীয় একটি বিশেষ ধারণা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন, অনেকে আবার একে ছদ্ম সেক্যুলারিজম আখ্যা দিয়েছেন।

এ আলোচনা থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে পশ্চিমের সেক্যুলারিজমের ধারণার সাথে এদিককার ধারণার কিছু পার্থক্য ঘটেছে। এর পশ্চাৎপট অনেক জটিল এবং বিস্তৃত, আমরা অত বড় আলোচনায় এখন যাব না।

আমরা লাস্কির মন্তব্য থেকে সেক্যুলারিজমের হাতিয়ার যে যুক্তি তা জেনেছি। এখন জানা দরকার আর কোন হাতিয়ার কিংবা বৈশিষ্ট্য এর থাকতে পারে? ইংরেজ দার্শনিক জর্জ জ্যাকব হোলিয়োক (George Jacob Holyoake) সেক্যুলারিজম এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:

"Secularism is a code of duty pertaining to this life, founded on considerations purely human, and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable."

এরপর হোলিয়োক সেক্যুলারিজমের তিনটি নীতির কথা বলেছেন– "1. The improvement of life by material means; 2. That science is the available Providence of man, 3. That it is good to do good. Whether there be other good or not, the good of the present life is good and it is good to seek that good."

হোলিয়োকের সংজ্ঞার ভিত্তিতে সেক্যুলারিজমের বাংলা ইহজাগতিক করা খাটে বটে, কিন্তু তাতে বাঙালি এবং উপমহাদেশীয় মানসের খটকা দূর হবে বলে মনে হয় না।

এখন দেখা দরকার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের আকাঙ্ক্ষা বারবার ব্যক্ত করে, এর জন্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে, এই আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে দেশ স্বাধীন করে, দীর্ঘ সংগ্রামমুখর আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার উৎখাত করে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেও আমরা কেন সেক্যুলার নই– না রাষ্ট্রে না সমাজে। বরং ঐতিহ্যগতভাবে এ সমাজে যে সমন্বয়ধর্মী মানবতাবাদী ধারাগুলো ছিল দিনে দিনে সেগুলো স্তিমিত ও স্থবির ও হয়ে জঙ্গি মৌলবাদের ধারা তৈরি ও পুষ্ট হচ্ছে।

'৪৭ এর দেশভাগের সময় হিন্দু–মুসলিম বৈরিতার তীব্রতায় বহুকাল গড়ে ওঠা সহনশীল মানবিক বাতাবরণ নষ্ট হতে থাকে, মুসলিম আত্মপরিচয় ও ইসলামি পুনরুজ্জীবনের এষণাও নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। এইখানে একটু স্পষ্ট করে বলতে চাই, মূলত সমাজের বড় দুই ধর্মসম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিম মিলেই বাঙালি সমাজের ঐতিহ্যবাহী সমন্বয়ধর্মী মানবতার সংস্কৃতি দাঁড় করিয়েছিল। বর্ণ হিন্দু এবং আশরাফ মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভক্তির প্রণোদনা থাকলেও নিম্নবর্ণের বিপুল গ্রামসমাজে সমন্বয়ের ধারাটাই প্রধান ছিল।

আমাদের সমাজে ভাব ও ভক্তিবাদের ঢেউ উঠেছে বারবার। বিশ্বাস ও সংস্কারের ঐতিহ্য পুরোনো বলে বেশ শক্ত তাদের শিকড়। এখানকার সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে এককালে ন্যায়, নব্যন্যায়, ন্যায়বৈশেষিকের মত লজিকের চর্চা হলেও তা সমাজে যুক্তি চর্চার পথ সুগম করতে পারেনি। বরং সমাজ চলেছে তার আপন মন্থর গতিতে ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাসের বেড়ি পায়ে। ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় তখনও সমাজকে যুক্তিবাদিতা ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার প্রয়াসগুলো ছিল সীমিত। রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র চেয়েছিল। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। বৃটিশ আমলে গ্রাম পর্যায়ে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তার সফল অংশ সাধারণত নগরে এসে ঔপনিবেশিক শাসকের অধীনে চাকুরি করেছে, তুলনামূলকভাবে অসফল অংশ হয়ত গ্রামে থেকে সেখানে একটা নেতৃস্থানীয় তবে ক্ষুদ্র এবং অনেকটা জনবিচ্ছিন্ন সমাজ তৈরি করেছে। '৪৭ এর দেশভাগের সময় হিন্দু–মুসলিম বৈরিতার তীব্রতায় বহুকাল গড়ে ওঠা সহনশীল মানবিক বাতাবরণ নষ্ট হতে থাকে, মুসলিম আত্মপরিচয় ও ইসলামি পুনরুজ্জীবনের এষণাও নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। এইখানে একটু স্পষ্ট করে

বলতে চাই, মূলত সমাজের বড় দুই ধর্মসম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিম মিলেই বাঙালি সমাজের ঐতিহ্যবাহী সমন্বয়ধর্মী মানবতার সংস্কৃতি দাঁড় করিয়েছিল। বর্ণ হিন্দু এবং আশরাফ মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভক্তির প্রণোদনা থাকলেও নিম্নবর্ণের বিপুল গ্রামসমাজে সমন্বয়ের ধারাটাই প্রধান ছিল। আমাদের রাষ্ট্র সাধনার রাজনীতি– কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, এমনকি বামপ্রগতিশীল ধারা– বাঙালি সমাজের এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও শক্তির জায়গাটি অনুধাবন করতে পারেনি। কীভাবে এই সম্ভাবনার বিকাশের পরিবর্তে রাজনীতির সূত্রেই দুই সম্প্রদায় দূরে সরে যাচ্ছে এবং সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে নিরন্তর সমন্বয়ধর্মী মানবতার উপাদান ক্রমে বিলীন হয়ে পড়ছে তাও যথাসময়ে খেয়াল করা হয়নি। ফলে বাঙালি রাষ্ট্রসাধনায় একান্ত নিজস্ব যে প্রত্যয় সমন্বয়ধর্মী মানবতা তাকে এগিয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টাই করা হয়নি।

পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা জোয়ার ঠিকই উঠেছিল। তাকে আমরা সেক্যুলার বলেও ভেবেছিলাম এবং সেইসূত্রেই রাষ্ট্রের চার মূলনীতির অন্যতম ঘোষিত হয় সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু ক্রমেই আমরা টের পাচ্ছি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজকে সেক্যুলার করা যায় না। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনীতি পাক শাসকবিরোধী ছিল বলেই উর্দুভাষী ও পাঞ্জাবি আধিপত্যের বিরুদ্ধে সেদিন বাঙালি হিসেবে একটা অবস্থান নিয়েছিল সবাই। ধর্ম, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সংস্কৃতি সরাসরি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পঠনপাঠনের যেটুকু বিস্তার ঘটেছিল তা চাকুরি ও ইহজাগতিক ভাবনা–অভ্যাসে প্রভাব ফেললেও ধর্ম, বিশ্বাসসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও মননশীল জিজ্ঞাসা, বিতর্ক ও অনুন্ধানের তেমন জন্ম দেয়নি।

ফলে নানা ঘটনায়– স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, পশ্চিমের যন্ত্রসভ্যতার নানা উপাচারে অভ্যস্ততা, সব ধরনের যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তৃতি সমাজের বহিরঙ্গে মানুষের জীবনাচরণে অনেক পরিবর্তন, ধর্মীয় চিহ্নলোপকারী সেক্যুলার পরিবর্তন ঘটলেও সমাজ মানসে বড় ধরনের কোন ভাবান্তর ঘটেনি। এখানে আমাদের শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা যে কত ব্যাপক তা ফাঁস হয়ে যায়।

ইসলামে ইজতিহাদ বা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান থাকলেও গত কয়েকশ' বছর ধরে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক আর সর্বত্র মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার ফলে কোথাও থেকে এরকম মুক্ত আলোচনার খবর পাওয়া যায় না। ফলে সারা বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম সমাজ স্থবির হয়ে পড়েছে এবং স্থবিরতাজাত নানা বিকার ও সংকটে ভুগছে। তার ওপর এখন পশ্চিমের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের থাবার তলায় পড়ে সংকট আরও জটিল হচ্ছে ও বেড়েই চলেছে।

এ শিক্ষা ডিগ্রি, সনদ ও কিছু বিদ্যাও দেয়, কিন্তু দেয় না প্রশ্ন করার সাহস ও ইচ্ছাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা লালনের প্রেরণা, মৌলিক চিন্তার প্রবণতা ও পুষ্টি। বরং এই শিক্ষাব্যবস্থা শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে এসবের যে কুঁড়ি থাকে তাকেই প্রতি স্তরে গুঁড়িয়ে দেয়। তাই কি শিক্ষিত কি শিক্ষাবঞ্চিত সকলেই প্রায় বিনা প্রশ্নে প্রচলিত সব বিশ্বাস ও সংস্কার মেনে নিচ্ছে এখানে। বরং দেখা যায় শিক্ষিতরাই দলে দলে প্রশ্ন ছেড়ে অন্ধবিশ্বাসের পতাকার নিচে আত্মসমর্পণ করছে আজ। ধর্মের নামে যেসব সংস্কার ও সংস্কৃতি চলে আসছে তাকে প্রশ্ন করার সংস্কৃতি আমাদের নেই– সেক্যুলার শিক্ষার ইতিহাস দু'শ বছরের পুরোনো হলেও।

এবারে ধর্মের একটু ভেতরের কথা বলি। ইসলামে ইজতিহাদ বা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান থাকলেও গত কয়েকশ' বছর ধরে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক আর সর্বত্র মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার ফলে কোথাও থেকে এরকম মুক্ত আলোচনার খবর পাওয়া যায় না। ফলে সারা বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম সমাজ স্থবির হয়ে পড়েছে এবং স্থবিরতাজাত নানা বিকার ও সংকটে ভুগছে। তার ওপর এখন পশ্চিমের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের থাবার তলায় পড়ে সংকট আরও জটিল হচ্ছে ও বেড়েই চলেছে।